ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪২, ১৪৩১/২০২৪, ১০৯-১২০
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4207

চট্টগ্রাম পৌরসভার পরিষেবা করারোপের প্রতিবাদে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন (১৮৭৫)

সুলতানা সুকন্যা বাশার
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: The British East India Company took over the administration of Chittagong in 1760. Hundred years later, balancing with the Indian subcontinent, a municipal governance system was formed in Chittagong. In 1864, the municipality began undertaking systematic urban development initiatives. In the discussed article, it is mentioned that in 1875, when a decision was made to construct public toilets in the city under the order of municipality chairman and district magistrate TM Kirkwood, local residents joined together to protest against it. Primarily, in this case we see two major reasons. First of all, the purdah system was affected and secondly, the tax imposed by the authority to use the toilet was seen as unnecessary. As a result, public dissatisfaction increased and the administration had to abolish it. In the 19^{th} century, among Indian locals, anti-British dissatisfaction surged. An attempt has been made in this essay to present this event.

Key Words: Chittagong Municipality, Public Toilet, TM Kirkwood, Nabinchandra Sen

ভূমিকা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে প্রশাসনিক অবকাঠামো নির্মাণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর থেকে। তারা বাংলার নদী ও সমুদ্র বন্দরগুলির প্রতি আগ্রহী হয়েছিল যেন ইংল্যান্ডের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সহজতর হয়। বন্দরকেন্দ্রিক এলাকাগুলিতে ইংরেজরা Port City গড়ে তোলার ফলে তৎকালীন শহর বন্দরগুলি প্রশাসনিক শহরে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। মূলত তাদের বাণিজ্য কুঠিগুলিকে কেন্দ্র করেই তারা নগরায়ন প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। ঐতিহাসিক Henry Pirenne (১৮৬২-১৯৩৫) এ প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে বলেন- ‘towns grow with growth of trade, particularly long distance trade.’[১] পরবর্তীতে এ সমস্ত অঞ্চলে ইউরোপীয় আধিকারিকদের বহুল উপস্থিতির ফলে শহরের নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণ অত্যাবশকীয় হয়ে পড়লে পৌরসভা গঠন এবং বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে নাগরিক পরিষেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তারা রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, জলনিঃষ্কাশন ব্যবস্থা, সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা, গণশৌচালয় নির্মাণের মাধ্যমে নাগরিক জীবনের উন্নয়ন সাধন করেছিল। এ সমস্ত পরিষেবা প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহে কর ধার্য করা হয়েছিল।

১৮৭৫ সালে চট্টগ্রাম পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান টি.এম.কির্কউড (মেয়াদকাল ১৮৭৫-৭৭) শহরের পরিবেশ রক্ষায় গণশৌচালয় স্থাপনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা স্থানীয় জনগণ অবশ্যই গ্রহণ করত, কিন্তু এ গণশৌচালয় ব্যবহারে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে বাধ্য করার প্রচেষ্টায় তাঁর বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম শহরবাসী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। সামাজিকভাবে পর্দাপ্রথার যে রীতি প্রচলিত ছিল তা গণশৌচালয় ব্যবহারে বাধ্য করা হলে ব্যাহত হবে। পরিবেশ রক্ষায় গণশৌচালয় নির্মাণ ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কারণ ব্যাখ্যা না করে মি. কির্কউডের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তটি নগরবাসীর কাছে তাঁর হেঁয়ালিপনা বলেই মনে হয়েছিল। এদিকে মি. কির্কউডের যুক্তি হল, ইংল্যান্ডে যদি রাস্তার পাশে খাবারের দোকান থাকতে পারে তবে এখানে কেন গণশৌচালয় থাকতে পারবে না![২] তাছাড়া কর ধার্যকরণের বিষয়টিও স্থানীয়দের মনঃপুত হয়নি। যেখানে স্থানীয়দের নিকট গণশৌচালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যই অস্পষ্ট ছিল সেখানে শৌচালয় ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর প্রদান বাহুল্য হিসেবে পরিগণিত হলে তারা এ সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতার একপর্যায়ে গণশৌচালয়ে অগ্নিসংযোগ করে এবং এ বিরোধিতার মুখে কির্কউড তাঁর দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করে উক্ত সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ আন্দোলন ছিল ব্রিটিশদের বিপক্ষে চট্টগ্রামবাসীর প্রথম সফল আন্দোলন।

মূলত, ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পৌরসভা সহ বিভিন্ন সায়ত্তশাসিত সেবাপ্রদান প্রতিষ্ঠানে স্থানীয়দের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করলে ধীরে ধীরে তাদের চেতনায় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে যার বহিঃপ্রকাশ উনিশ শতকের নানাবিধ প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিহাসে দেখা যায়। আলোচ্য বিষয়টি চট্টগ্রামের ইতিহাসচর্চায় আলোচিত হলেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যালোচনার উদ্দ্যেশে এর সামগ্রিক তথ্যাদি প্রবন্ধে তুলে আনার প্রয়াস নিয়েছেন গবেষক।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও গৃহীত পদ্ধতি

চট্টগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনায় ইংরেজ প্রশাসক কর্তৃক পৌরসভা গঠন ও তার প্রদেয় পরিষেবাগুলির মধ্যে গণশৌচালয় প্রতিষ্ঠা পরবর্তি কর ধার্য করলে চট্টগ্রামের জনগণের সম্মিলিত প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের সাফল্য ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন প্রবন্ধের গবেষক। উনিশ শতকে ব্যক্তিউদ্যোগে কিংবা সমষ্টিগতভাবে বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত আন্দোলনটি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এতে সরকার মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হয়েছিল। ফলে উক্ত ঘটনাটি বৃহৎ পরিসরে পর্যালোচনা হওয়া জরুরি মনে হয়েছে গবেষকের। বর্ণণামূলক এ প্রবন্ধে প্রাথমিক উৎস হিসেবে

জেলা গেজেটিয়ার ও সেনসাস রিপোর্ট সমূহ এবং মাধ্যমিক উৎসে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট গবেষকদের গ্রন্থাদি ব্যবহৃত হয়েছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চট্টগ্রাম দখল ও পৌরসভা গঠন

হিন্দু শাসন পরবর্তী মুসলিম যুগের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি হল গৌড়, একডালা, সাতগাঁও, হুগলি, চাটিগ্রাম (চট্টগ্রাম), ঢাকা, সোনারগাঁও ও মুর্শিদাবাদ।[৩] তবে, প্রাচীনকাল থেকে সুপ্রসিদ্ধ বন্দরনগরী চট্টগ্রামের প্রতি বিদেশি বণিকদের সুপ্রসন্ন দৃষ্টির বদৌলতে রাষ্ট্রের রাজস্ব খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় ত্রিপুরা, আরাকান ও মুঘল রাজশক্তির মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান ছিল বহুবছর। এর পূর্বে পর্তুগীজ ও মগদের আক্রমণ ও কুশাসনে জর্জরিত ছিল চট্টগ্রামের জনগণ। ১৫৩৮-১৬৬৬ সাল[৪] পর্যন্ত প্রায় ১২৮ বছর চট্টগ্রামে স্থায়ী শাসন ব্যবস্থার ইতিবাচক প্রভাব খুব একটা দেখা যায়নি। ১৬৬৬ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬১৮-১৭০৭) আমলে মুঘল সেনাবাহিনী আরাকানের দখল থেকে চট্টগ্রাম উদ্ধার করে স্বীয় অবস্থান মজবুত করে।[৫]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ব্রিটিশরা বাণিজ্যিক সুবিধাদি বর্ধিতকরণের লক্ষ্যে ভারতের নদী ও সমুদ্র বন্দরকেন্দ্রিক বাণিজ্যকুঠি স্থাপনে তৎপর হয়ে উঠে। এরই ধারাবাহিকতায় জব চার্ণক (১৬৩০-১৬৯৩) সুতানটি গ্রামে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের পর কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টস উইলিয়াম হিথকে চট্টগ্রাম অভিযানের দায়িত্ব দেয় ১৬৮৮ সালে। যদিও সেটি ব্যর্থ হয়। সুসজ্জিত মুঘলদের সাথে সামরিক শক্তিতে পেরে উঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ উপলদ্ধি করে চট্টগ্রাম দখলের পরিবর্তে উক্ত স্থান থেকে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে অগ্রসর হয় কোম্পানি। নবাব সিরাজউদ্দোলার (১৭৩২-১৭৫৭) পতনের পর হেনরি ভ্যানসিটার্ট (১৭৩২-১৭৭০) কোম্পানির গভর্নরের দায়িত্ব নিয়ে বাংলায় আসেন এবং কোম্পানির পূর্ববত পাওনা মেটাতে নগদ অর্থের পরিবর্তে চট্টগ্রামের দিওয়ানি কোম্পানিকে প্রদানের জোর তদবির করলেও শুধুমাত্র বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অধিকার লাভ করেন।

পরবর্তীতে মীর কাশিমের (মৃ-১৭৭৭) সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বাংলার মসনদের পরিবর্তে মেদিনীপুর, বর্ধমানসহ চট্টগ্রামের দিওয়ানি কোম্পানিকে প্রদানের শর্তে ১৭৬০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়[৬] যা কার্যকরী করা হয় ১০ অক্টোবর, ১৭৬০ সালে।[৭] এ সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান কোম্পানির প্রশাসনিক, ব্যবসায়িক ও রাজস্বনীতি বাংলার নগরায়নের ঐতিহ্যগত প্রক্রিয়ার আমূল পরিবর্তন সাধন করে।[৮] ১৭৬১ সালের ১ জানুয়ারি কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তা হ্যারি ভেরেলস্টকে (১৭৩৪-১৭৮৫) চট্টগ্রামের গর্ভনর ও তাঁর সহকারী হিসেবে র‍্যান্ডলফ ম্যারিয়ট, ওয়ান্টার উইলকিন্স[৯] ও টমাস রম্বলডিকে নিয়োগ দেয়া হয় কলকাতা কাউন্সিল থেকে।[১০] তাঁরা ১৭৬১ সালের ৫ জানুয়ারি চট্টগ্রামের শেষ মুঘল শাসক হাকিম মোহাম্মদ রেজা খানের (মৃ-১৭৯২/৯৩) কাছ থেকে চট্টগ্রামের শাসনভার বুঝে নেন।[১১]

তৎকালীন নাগরিক জীবনের ধরন ঠিক শহুরে ছিল না বরং গ্রাম্য জীবনের চেয়ে কিছুটা উন্নত ছিল বলাই যথাযথ। ইংরেজদের শাসনভার গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায়ে নগরবাসীদের প্রকৃত নাগরিক নিয়মে অভ্যস্ত করাতে তাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ১৭৭৬ সালে চট্টগ্রামের প্রশাসক ফ্রান্সিস লো সুনিয়ন্ত্রিত নাগরিক জীবনের পত্তন ঘটাতে একটি কমিটির মাধ্যমে বেশ কিছু নিয়মাবলী প্রনয়ণ করেছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম ছিল গাড়ি চালানোর রাস্তা নির্মাণ ও উক্ত রাস্তার সুরক্ষার জন্য মে-অক্টোবর মাস পর্যন্ত অর্থাৎ বর্ষাকালে কোন হাতি রাস্তায় চলাফেরা করতে পারবে না।[১২] সেসময় যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে হাতি ও ঘোড়ার প্রচলন ছিল বিধায় এ আদেশ জারি করা হয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলিতে প্রয়োজন সাপেক্ষে শহরটিতে নাগরিক সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসকগণ বেশ সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন।

এদিকে প্রায় ১০০ বছর পর কলকাতা শহরের উন্নয়নে ১৮৬২ সালের ৩ মে মিউনিসিপ্যালটি গঠনের প্রস্তাব দেয় কলকাতা কাউন্সিল;[১৩] যার ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালটি গঠিত হয়। মূলত, শহরের পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যার সমাধানকে প্রাধান্য দিয়ে পৌরসভা গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরা হয়েছিল।[১৪] কেননা, চাকতাই খাল থেকে কয়েক কিলোমিটারের ব্যবধানে চট্টগ্রাম শহরের অবস্থান সীমাবদ্ধ থাকাতে শহরের সকল পানি এ খালই বহন করত এবং এ ব্যবস্থাকে নিরুপদ্রপ রাখতে ১৮৫৫ সালে Committee for the Sanitary Improvement of the town of Chittagong গঠন করা হয়েছিল।[১৫] কয়েক বছর ধরে এ কমিটি শহরের উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম চালানোর এক পর্যায়ে ১৮৬০ সালের ২০ জুনের সভায় প্রথমবারের মতো 'মিউনিসিপ্যাল কমিটি' শিরোনামে তার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করে, যার সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত কমিশনার সি.ই.ল্যান্স এবং চট্টগ্রামের কালেক্টর কাম ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিটি সচিব জে.ডি ওর্য়াড।[১৬]

কোম্পানি চট্টগ্রামের শাসনভার দখলের প্রায় ১০২ বছর পর অর্থাৎ ১৮৬৩ সালে 'চট্টগ্রাম পৌরসভা' গঠিত হলেও পৌরসভা আইনের বিধানভুক্ত হয় ১৮৬৪ সালের জুলাই মাসে।[১৭] ভিন্ন নামে পৌরসভার কার্যক্রম ১৮৫৬ সালে শুরু হলেও প্রতিষ্ঠাসূত্রে ২০ জুন, ১৮৬০ তারিখটি একটি মাইলফলক বটে; যদিও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নথিপত্রে ২২ জুন, ১৮৬৩ তারিখকে কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা তারিখ হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। তবে, সরকারি অনুমোদন পায় মূলত ১৮৬৪ সালের ৫ জুলাই।[১৮] সৈয়দ মুর্তজা আলীর মতে, ১৮৬৩ সালের ১ জুন ৭ সদস্য বিশিষ্ট মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠিত হয় বলে তিনি উক্ত তারিখটিকে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালটির প্রতিষ্ঠা তারিখ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।[১৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চট্টগ্রামের শহরের তৎকালীন সীমানা সম্পর্কে ঐতিহাসিক পূর্ণচন্দ্রের তথ্যে জানা যায়, চট্টগ্রাম শহরের উপযোগিতা অনুধাবনপূর্বক পূর্বে তৎকালের চাকতাই খাল, উত্তরে চাকতাই নালা হতে বিবিরহাটের উত্তর দিয়ে নাসিরাবাদ পাহাড়

পর্যন্ত, পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণে খুলসী পাহাড়ের ধার ঘেঁষে দক্ষিণ-পশ্চিমে কর্ণফুলি নদীর সীমান্তবর্তী ভূভাগ পৌরসভার অর্ন্তভুক্ত করা হয়।[২০]

পৌর পরিষেবা প্রদানকল্পে উন্নয়নমুখী কর্মসূচি গ্রহণ

মুঘল আমলে চট্টগ্রাম শহর মূলত ফতেয়াবাদ ও সীতাকুন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় শহরের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড তাদের বিচার কার্যক্রমের আওতাধীন স্থানসমূহের মধ্যেই নির্দিষ্ট ছিল। ফলে অন্যান্য মুঘল শহরগুলির মতো এ শহর পরিপূর্ণতা পায়নি। অনুসন্ধানে জানা যায় তৎকালে জনগণ শহরে বসতবাড়ি তৈরি করে থাকাকে নিন্দনীয় মনে করত।[২১] এমনকি, স্বল্প সংখ্যক লোকজনের বাসাবাড়ি থাকলেও শহরের কাজকর্ম সেরে তারা দ্রুততম সময়ে গ্রামে ফিরে যেত।[২২] ব্রিটিশ আমলে নগরায়নের প্রক্রিয়া শ্লথ হলেও নগরগুলির পৌরজীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন কার্যব্যবস্থা উদ্ভাবন হয়েছিল যা মূলত স্থানীয় নাগরিক জীবনের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ইংরেজ আমলে চট্টগ্রামের উত্তরাংশেই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ ছিল এবং বর্তমান কাপাসগোলা, শুলকবহর, মেহেদিবাগ, কাতালগঞ্জ, রহমতগঞ্জ, হামজারবাগ, জয়নগর, কাঠগড়, দেওয়ানবাজার, বাগমনিরাম, এনায়েতবাজার, ফিরিঙ্গবাজার, আন্দরকিল্লাসহ কিছু এলাকা তৎকালীন শহরের অর্ন্তভুক্ত ছিল।

মাত্র ৬ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে তৎকালীন মিউনিসিপ্যালটির যাত্রা শুরু করেছিল এবং প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন জে.ডি.ওয়ার্ড।[২৩] ঐতিহাসিক পূর্ণচন্দ্রের মতে, পৌর এলাকার জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২,২৪৪ জন যদিও হান্টারের মতে এ সংখ্যা প্রায় ২০,৬০৪ জন। চট্টগ্রাম পৌরসভা প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ১৭৭৬ সালে তৎকালীন প্রশাসক ফ্রান্সিস লো'র গঠিত কমিটি সুনিয়ন্ত্রিত শহুরে জীবনকেন্দ্রিক কিছু নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছিলেন যার মধ্যে অন্যতম হল গাড়ি চলাচলের রাস্তা নির্মাণপূর্বক প্রতি চাকার জন্য কর বা ট্যাক্স নির্ধারণ এবং বর্ষাকালে রাস্তার সুরক্ষায় হাতি চলাচল নিষিদ্ধকরণ। তাছাড়া, কমিটির সদস্যদের জন্য নিয়মিত রাস্তা পরিদর্শন ও চাঁদা প্রদান বাধ্যতামূলক ছিল এবং যেকোন প্রকার গাফিলতির জন্য ২০ টাকা ৪ আনা জরিমানা ধার্য করা হয়েছিল। এছাড়াও সরকারি ডাক ব্যতীত অন্য ব্যবস্থার মাধ্যমে চিঠিপত্র আদান-প্রদানে জরিমানা ধার্য, সভায় অনুপস্থিত থাকলে সভ্যদের জরিমানা প্রদান সহ বহুবিধ নিয়ম চালু করা হয়।[২৪]

পৌরসভা গঠনের পর স্বাভাবিক নিয়মে শহরের উন্নয়ন তথা নাগরিক জীবনের স্বস্তিকর প্রসারে ইংরেজ সরকার যথেষ্ট উদ্যোগী ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে নগর ও শহর উন্নয়ন কমিটি এবং পরবর্তীকালে পৌরসভা ও কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রশস্ত রাস্তা ও সরকারি ভবনাদি নির্মাণ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তার বাতি, আবর্জনা দূরীকরণ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তনের ফলে নগর ও শহরগুলিতে আধুনিক জীবনযাত্রার উদ্ভব হয়।[২৫] এদিকে কাজের সুবিধার্থে চট্টগ্রাম শহরকে তারা প্রথমে ৪টি ওর্য়াডে বিভক্ত করলেও পরে ৫টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরের প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্যে বিরূপ প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক জলাধারের নিকট কাপড় কাচা ও পয়ঃনিষ্কাশন অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বিষয় ছিল। এতে পুকুরের পানি অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে এবং কর্ণফুলি নদীর পানির সাথে জোয়ারের সময় উক্ত পুকুরের পানি মিশে মারাত্মক বিক্রিয়া ঘটাতো। ডায়রিয়া, কলেরা ও ম্যালেরিয়ার মতো জটিল রোগে জনগণ আক্রান্ত হত আশংকাজনক হারে।[২৬]

এর প্রতিকারে ১৮৭৫ সালে চট্টগ্রাম পৌরসভায় গণ-শৌচালয় নির্মাণ ও তার উপর করারোপ করা হয়েছিল। আরো পরে প্রাকৃতিক উৎস ব্যতীত সরকারিভাবে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পানির কল স্থাপন করা হয়েছিল বলে জানা যায়।[২৭] রেজা খানের আমলে চট্টগ্রাম শহরের বাৎসরিক করের পরিমাণ ৩৩৭৭৩১ টাকা নির্ধারিত -হলেও নাগরিক সুবিধা প্রদানের প্রেক্ষিতে ইংরেজ প্রশাসন মোটা অংকের কর ধার্য করায় চট্টগ্রাম শহরের বাৎসরিক কর নির্ধারিত হয় ৪৪০৩৭৯ টাকা। ঔপনিবেশিক ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে চট্টগ্রামের ন্যায় এত উচ্চ কর ধার্য করা হয়নি বলে জানা যায়।[২৮] ফলে চট্টগ্রামের স্থানীয় জনগণ এর যৌক্তিকতার প্রশ্নে অবস্থান নেয়, কেননা উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে স্থানীয় জনগণ শিক্ষার পাশাপাশি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ায় নিজস্ব অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে উঠে। যার প্রেক্ষিতে, চট্টগ্রাম পৌরসভার গণ-শৌচালয় স্থাপন ও এর উপর ধার্যকৃত করের বিষয়ে জনগণ বেশ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল ঐ সময়ে।

চট্টগ্রামে গণ-শৌচালয় স্থাপন ও করারোপের প্রতিবাদে ইংরেজ বিরোধী প্রথম আন্দোলন ও আন্দোলন উত্তর গৃহীত পদক্ষেপ

ভারতের অন্যান্য স্থানের মতোই চট্টগ্রাম পৌরসভার প্রতিষ্ঠা নাগরিকদের সমাজজীবনে নিয়ে আসে এক অভিনব উপাদানিক বৈশিষ্ট্য। তবে, এতে আশ্চর্যের বিষয় হলো- স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকর্তাদের অবিরাম চেষ্টার ফলে বেশিরভাগ শহরে পৌর সুবিধার উন্নতি ঘটলেও জনগণ এর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি মূলত আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে।[২৯] তাছাড়া, স্থানীয় সমাজের লোকাচার ও পর্দাপ্রথাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়টির ক্ষেত্রে। কেননা, ১৮৭৫ সালে চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট টি.এম. কির্কউড, যিনি পদাধিকার বলে পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে যখন চট্টগ্রামের পরিবেশ রক্ষায় গণশৌচালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং এর উপর কর ধার্য করেন[৩০] তখন, নগরীর স্থানীয় জনগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। কির্কউডের এ উদ্যোগ গ্রহণের মূল কারণ ছিল নগরের প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূর্গন্ধ মুক্ত রাখা এবং প্রাকৃতিক জলাধার সমূহের বিশুদ্ধতা নিশ্চিতকরণ- যদিও জনগণ এ উদ্যোগ স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়নি।

তাঁর এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে মহৎ ছিল কেননা চট্টগ্রাম শহরে শৌচালয়ের প্রয়োজন রয়েছিল বলে জানা যায়।[৩১] তবে এক্ষেত্রে তিনি বেশ বাড়াবাড়ি করেছিলেন বলেও জানা যায়। তিনি কমিটির সদস্যদের সাথে কোন আলোচনা না করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কারণ সদস্যদের মধ্যেও এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। এছাড়াও,

জনগণকে গণ-শৌচালয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনবহিত রেখেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই শৌচালয় ব্যবহারে বাধ্য করতে পুলিশি হস্তক্ষেপের অনুমতি প্রদান সহ কর ধার্য করার খবর ছড়িয়ে পড়লে হিন্দু-মুসলিম সকলেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়। পর্দাপ্রথার দরুন যেখানে মুসলিম মহিলারা ঘরের বাইরে বেরই হতেন না সেখানে শৌচালয় ব্যবহারে বাধ্য করাটাও তাদের জন্য নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর হয়ে পড়ে। এদিকে, শহরের অধিবাসীরা পৌরসভা অফিস ঘেরাও করে কমিশনারদের উপর চড়াও হয়।

অন্যদিকে এসবের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে মিঃ কির্কউড শহরের চার প্রান্তে বৃহদাকার এবং বহু কক্ষ বিশিষ্ট চারটি শৌচালয় নির্মাণ করেন এবং প্রতিটির নির্মাণ ব্যয় ছিল তৎকালীন আটশত টাকা। বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখে এগুলো নির্মাণে প্রাথমিকভাবে তিনি স্থানীয় মুলি (চিকন) বাঁশ ব্যবহার করেছিলেন। সে সময় একশত মুলি বাঁশের দাম ছিল দু'আনা।[৩২] এতে স্পষ্টত বোঝা যায় বেশ বিশাল আকৃতির শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছিল। তাছাড়া বিহারসহ বিভিন্ন প্রদেশ থেকে শৌচালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে মেথর নিয়ে আসা হয়েছিল। এদিকে স্থানীয়রা কমিশনার লাউইসের নিকট আপিল করলেও তিনি এক্ষেত্রে নীরব ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী বিশিষ্ট লেখক নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) মতে- মিঃ কির্কউড স্বয়ং কমিশনারের সাথে দেখা করে নগরে শৌচালয় নির্মাণের বিষয়টি জানিয়েছিলেন বিধায় মিঃ লাউইস নীরব ভূমিকায় ছিলেন।[৩৩] যাই হোক, কমিশনারের নীরবতায় শহরের জনগণ 'বেনা কানুন' (ফার্সি ভাষা ও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণে উদ্ভুত শব্দটির অর্থ- আইন অমান্য করা) জারি করে এবং 'লাল বিরিষ' (চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় এর অর্থ আগুন) জ্বালিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে পরের দিনই স্থানীয়রা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পৌরসভার কাছারি সংলগ্ন শৌচালয়টি ছাড়া বাকি তিনটায় অগ্নিসংযোগ ঘটায়।

এ অবস্থায় মিঃ কির্কউড দিশেহারা হয়ে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা নিলেও শৌচালয়গুলি মুহূর্তেই ভস্মীভূত হয়। এ ঘটনায় তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তরিৎ সিদ্ধান্তে স্থানীয় জমিদার, সওদাগর ও পৌরসভার সম্মানিত কমিশনার জনাব লালচাঁন্দ চৌধুরীর (তিনি হিন্দুস্তানি গুড়ি বংশীয় মোগল সৈনিকের বংশধর ছিলেন) নামে ফৌজদারি মামলাও করেছিলেন। কারণ তাঁর সাথে স্থানীয় সকল হিন্দু-মুসলিমের হৃদ্যতা থাকায় শৌচালয় নির্মাণের বিপক্ষে নগরবাসীর সাথে তিনিও একাত্মতা ঘোষণা করেন। এছাড়া উদ্ভুত পরিস্থিতি সামাল দিতে মিঃ কির্কউড শহরের নেতৃস্থানীয় মুসলমান সাথে লালচাঁন্দ চৌধুরীকেও তাৎক্ষণিকভাবে কনস্টেবলের (বিশেষ পাহারাদার) দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি তা নাকচ করলে মিঃ কির্কউড লালচাঁন্দ চৌধুরীকে উক্ত ঘটনার মূল আসামী হিসেবে চিহ্নিত করে মামলা করেন।[৩৪] ফলে মিঃ কির্কউড জনগণের নিকট সমালোচিত হয়েছিলেন। এ মামলায় আসামীপক্ষের উকিল নিযুক্ত হয়েছিলেন কলকাতার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার শ্রী মনমোহন ঘোষ।

মূলত, নবীনচন্দ্র সেনের অনুরোধে তিনি এ মামলা গ্রহণ করেন এবং কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে পৌঁছাতে তখন দু'দিন সময় লাগত বিধায় তিনি মিঃ কির্কউডের নিকট মামলা দু'দিন স্থগিত রাখার অনুরোধ করলেও সে আবেদন নাকচ হয়। এদিকে নবীনচন্দ্র সেন শৌচালয় স্থাপন ও কর ধার্যকরণ সংক্রান্ত উদ্ভূত ঘটনার বিশদ বিবরণ ছদ্মনামে তুলে ধরেছিলেন কলকাতার পত্রপত্রিকাসমূহে যা একপ্রকার আন্দোলনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীতে মনমোহন ঘোষ চট্টগ্রামে পৌঁছানোর পর নবীনচন্দ্রের পরামর্শে মামলাটি হাইকোর্টে স্থানান্তর করতে মিঃ লাউইসের নিকট আবেদন করেন। এ মামলা হাইকোর্টে গড়ালে মিঃ কির্কউডের অবস্থা সুবিধাজনক নয় অনুধাবন করে মিঃ লাউইস একদিনের ব্যবধানে বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষকে তাঁর অফিস কক্ষে উপস্থিত থেকে মামলার শুনানি শুরু করার অনুরোধ করলেও এতে বাদীপক্ষ রাজি ছিল না।

এ সময়ক্ষেপনে লেখক নবীনচন্দ্র সেন ছদ্মনামে কলকাতার পত্রিকাগুলিতে উক্ত বিষয়ের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিবরণাদি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়- উক্ত বিষয়টি সমগ্র ভারতে বেশ আলোড়ন তৈরি করেছিল এবং বিবাদীকে বীরপুরুষ হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে ভারতবাসী রীতিমতো একাত্মতা ঘোষণা করেছিল বলেও লেখকের বিবরণে জানা যায়।[৩৫] এরই মধ্যে মনমোহন ঘোষ মামলাটি আবারো হাইকোর্টে স্থানান্তর করতে পুনরায় আবেদন করায় এবং পত্রিকার খবরের প্রেক্ষিতে জনগণের একাত্মতায় ভীত হয়ে মিঃ লাউইস মিঃ কির্কউডের নিকট মামলা উঠিয়ে নিতে পত্র দেন। পক্ষান্তরে মিঃ কির্কউড অনিচ্ছাসত্ত্বেও মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৩৬]

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে ভারতীয় জনগণ রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল। এর সূত্রপাত হয়েছিল ১৭৭২ সালে বাংলার দিওয়ানি ক্ষমতা রেজা খানের হাত থেকে নতুন শাসকের তথা কোম্পানির হাতে চলে যাওয়ার পর থেকেই কৃষক সমাজ ও ধর্মীয় গোষ্ঠী নতুন শাসকের উৎপীড়ন সইতে থাকে তখন থেকেই উক্ত গোষ্ঠীদ্বয়ের সরকার বিরোধী প্রতিরোধ শুরু হয়।[৩৭] তখন থেকেই উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত প্রতিরোধ প্রতিবাদের ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার তীব্রতা বা ভয়াবহতায় ভিন্নতা থাকলেও এর নেপথ্যে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাই প্রাধান্য পেয়েছিল সকলের কাছে।[৩৮] যাই হোক, চট্টগ্রামের প্রথম ইংরেজ বিরোধী গণ-আন্দোলন হিসেবে শৌচালয় স্থাপন ও করধার্য করণের প্রতিবাদে পরিচালিত আন্দোলনকেই গণ্য করা হয়। এ আন্দোলন নগরবাসীর পক্ষে থাকার পশ্চাতে স্থানীয়দের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দাবি আদায়ের রাজনীতি শুরু হতেই তাঁরা জনগণের প্রত্যক্ষ সর্মথনে আন্দোলনকে জোরদার ও ফলপ্রসু করতে সক্ষম হয়েছিল।[৩৯]

ব্রিটিশ শক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল পরবর্তী কোম্পানির বাণিজ্যিক নীতি ও ঔপনিবেশিক শাসননীতি ভারতীয় নগরায়ন প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলেছিল এবং এ প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।[৪০] শুরুর দিকে এ নগরায়নের প্রক্রিয়ায় ইংরেজদের আধিপত্য থাকলেও ধীরে ধীরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি যথাক্রমে ইউনিয়ন বোর্ড, জিলা বোর্ড, পৌরসভা বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে।[৪১] যদিও এতে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রসারে পরস্পরবিরোধী সম্পর্কের সূত্রপাত হয়েছিল।[৪২] তবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, পৌরসভাগুলিই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের লালনক্ষেত্র রূপে কাজ করেছিল।[৪৩] চট্টগ্রামের এ আন্দোলনে আমরা তারই সত্যতা প্রত্যক্ষ করেছি। পরবর্তীতে বাংলার গর্ভনর রিচার্ড টেম্পল (১৮২৬-১৯০২) উক্ত ঘটনার সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা পূর্বক মিঃ কির্কউডের পদাবনতি ক্রমে অন্য জেলায় বদলি করার আদেশ দিয়েছিলেন।

১৮৯৩ সালে আরো একবার শৌচালয় কর ধার্যের প্রসঙ্গ উঠলে জনগণের প্রতিবাদের মুখে তা ব্যর্থ হয়েছিল। তবে শহর যখন উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত হতে থাকে এবং চাকরিসূত্রে ইংরেজসহ স্থানীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন জনগণ গণ-শৌচালয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং ১৮৯৬ সালে চট্টগ্রাম শহরে শৌচালয় কর প্রবর্তিত হয়েছিল।[৪৪]

গণ-শৌচালয় স্থাপন ও করধার্যের যৌক্তিকতা

নগরকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অনভ্যস্ত চট্টগ্রাম শহরের স্থানীয় জনগণের সংখ্যা শহরের আয়তনের তুলনায় নিতান্তই কম ছিল বিধায় গণশৌচালয় নির্মাণ ও তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা বেশ উদাসীন ছিল। সেক্ষেত্রে ইংরেজরা ক্ষমতা নেয়ার পর চট্টগ্রাম শহরকে পরিবেশবান্ধব ও স্বীয় বসবাসপোযোগী করে তুলতে নানারকম উন্নয়নমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এক্ষেত্রে গণ-শৌচালয় স্থাপন এবং এর উপর কর ধার্যকরণ অপ্রয়োজনীয় উদ্যোগ ছিল না বরং এ প্রক্রিয়ায় জনগণকে অভ্যস্ত করাতে পারলে সুষ্ঠু প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় থাকত বলে ধারণা করা যেতে পারে। তবে এ উদ্যোগ প্রণয়ণকারী মিঃ কির্কউডের 'চাপিয়ে দেয়া' মনোভাবের জন্য এবং পুলিশের হস্তক্ষেপের বিষয়টি জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ভারতীয় জনগণের জীবনযাপন পদ্ধতি ইউরোপীয়দের মতো ছিল না এবং সামাজিকভাবে নারী-পুরুষ বিশেষ করে নারীদের পর্দাপ্রথা যেহেতু প্রচলিত ছিল সেহেতু মিঃ কির্কউড যদি মাঠ পর্যায়ে সমাজের চিত্র অবলোকন করে নারীদের জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও পর্দা ব্যবস্থার মাধ্যমে গণ-শৌচালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলে জনগণের আস্থাভাজন হয়ে উঠতেন।

নগরবাসীকে যথাসম্ভব উন্নত নাগরিক পরিষেবা প্রদানের জন্য কর ধার্য করার বিষয়টিও যৌক্তিক ছিল। কেননা, গণ-শৌচালয়ে পানির ব্যবস্থা করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মেথর আনয়ন, তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ও বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থের যোগানে কর আদায়ের যৌক্তিকতা ছিল। তাছাড়া, পরবর্তীতে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গণ-শৌচালয় স্থাপনের প্রয়োজন প্রকটভাবে অনুভূত হওয়ায় প্রমাণিত হয় ইংরেজদের উদ্যোগটি যথাযথ ছিল। পৌরসভার গৃহীত অন্যান্য পরিষেবাসমূহ শহরের আধুনিকায়নে ভূমিকা রেখেছিল। বর্তমানে আধুনিক নগর পরিকল্পনায় গণ-শৌচালয় স্থাপন একটি বিশেষ নাগরিক সুবিধার মধ্যে পরিগণিত হয় এবং এর পরিচর্যায় জনপ্রতি অর্থ গ্রহণের বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। ইদানিং গ্রামাঞ্চলের বাজারগুলিতেও শৌচালয়ের ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। তবে, চট্টগ্রাম শহরের উক্ত ঘটনার মাধ্যমে আমরা এতটুকু নিশ্চিত হতে পেরেছি যে- সরকার নগরের কিংবা রাষ্ট্রের উন্নয়নে যেসমস্ত কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে তার যৌক্তিকতা জনগণের নিকট উত্থাপন করলে তা সহজেই জনগণ গ্রহণ করবে।

উপসংহার

নগরজীবনের উন্নয়নে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন রকম পরিষেবামূলক কার্যক্রমের বহু দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় উপনিবেশিক আমলে। ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনে শহর পরিবর্ধনসহ জনগণের জন্য উন্নত পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। চট্টগ্রাম শহরে তাদের নানারকম পরিষেবার মধ্যে গণ-শৌচালয় স্থাপনপূর্বক করধার্যের উদ্যোগটি তৎকালীন নগরবাসী ইতিবাচকভাবে নেয়নি বরং তীব্র প্রতিবাদী হয়ে পৌরসভার কার্যালয় ভাঙ্গচুরসহ শৌচালয়ে অগ্নিসংযোগ করেছিল। যদিও বেশ কয়েক বছর পর ইংরেজ প্রশাসকদের ঐকান্তিক চেষ্টায় চট্টগ্রাম শহরের চারপ্রান্তে শৌচালয় স্থাপন ও কর আদায়ের ব্যবস্থা করেছিল। আধুনিক নগরায়নের ক্ষেত্রে গণ-শৌচালয় কেন অতীব প্রয়োজনীয় একটি স্থাপনা তা তৎকালীন জনগণকে সঠিকভাবে না বুঝিয়ে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ায় উক্ত আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছিল ইংরেজ প্রশাসন। উনিশ শতকে ভারতীয় জনগণের শিক্ষা ও রাজনৈতিক জ্ঞান তাদেরকে উপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে ও স্বীয় অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বেশ সচেতন করে তুলেছিল। তবে এক্ষেত্রে আমরা স্থানীয় জনগণের নিজস্ব রীতিকে (পর্দাপ্রথা) সসম্মানে জিইয়ে রাখার এক অনন্য প্রচেষ্টা দেখতে পাই। আলোচ্য ঘটনাটি চট্টগ্রামে ইংরেজ বিরোধী প্রথম ও সফল আন্দোলন হিসেবে জাতীয় ইতিহাসে স্থান দখল করবে বলে আশা করা যায়। কেননা, জাতীয় পর্যায়ের ইতিহাস মূলত আঞ্চলিক ইতিহাসের ভিত্তিতেই সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

---

১ Satish Chandra, *The City in Indian History*, (New Delhi: Monohar, 2005), 81.

২ আবদুল হক চৌধুরী, *শহর চট্টগ্রামের ইতিকথা*, (চট্টগ্রাম: কথামালা, ১৯৮৫), ২০৭।

৩ Barrie M. Morison, *Political Centres and Cultural Religious in Early Bengal*, (Tucson: University of Arizona, 1980), p.12.

৪ Sayeda Fatema, City of Chittagong: History and Aspects of Urban Development During British Period; মোহাম্মদ আলী চৌধুরী (সম্পা.), *চট্টগ্রাম: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ১ম খন্ড, (ঢাকা: বেঙ্গল কম-প্রিন্ট, ২০১৫), ৫৩।

৫ Sayed Murtaza Ali, *History of Chittagong*, (Dacca: Stadard Publishers Ltd., 1964), p.6. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. VI, (Delhi: DK Publishing House, 1973), 110.

৬ হারুন রশীদ, *উপনিবেশ চট্টগ্রাম*, (চট্টগ্রাম: পূর্বস্বর, ২০২১), পৃ. ১৬২-১৬৩।

৭ W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. VI, (Delhi: DK Publishing House, 1973), 114.

৮ *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খন্ড, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), ১২৫।

৯ ডি. কে. ঘোষ, *চট্টগ্রাম*, (চট্টগ্রাম: আবীর প্রকাশন, ২০০৯), ১০।

১০ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, জিলা চট্টগ্রামের পুরাতন ও নূতন বিবরণ; কমল চৌধুরী (সম্পা.), *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০), ১৮৭।

১১ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রাম-আরাকান*, (চট্টগ্রাম: কথামালা প্রকাশনা, ১৯৮৯), পৃ. ১৪৬।

১২ ওহিদুল ইসলাম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, (চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ), ৭৩-৭৪।

১৩ C.E. Buckland, *Bengal Under the Lieutenant Governors*, Vol-I, (Culcutta: S.K.Lahiri & Co, 1901), 279.

১৪ হারুন রশীদ, *উপনিবেশ চট্টগ্রাম*, (চট্টগ্রাম: পূর্বস্বর, ২০২১), পৃ. ২০৫।

১৫ L.S.S.O'Malley, *Eastern Bengal Distric Gazetteer-Chittagong*, (Culcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1908), 126.

১৬ L.S.S.O'Malley, *Eastern Bengal District Gazetteer-Chittagong*, (Culcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1908), 206-207.

১৭ আবদুল হক চৌধুরী, *শহর চট্টগ্রামের ইতিকথা*, (চট্টগ্রাম: কথামালা, ১৯৮৫), ২০৬।

১৮ Suniti Bhushan Qanungo, *A History of Chittagong*, Vol-II, (Chittagong: Kanungopara, 2010), 85.

১৯ Syed Murtuza Ali, *History of Chittagong*, (Dacca: Standard Publishers Ltd, 1964), 117; S.N.H. Rizvi (ed.), *East Pakistan District Gazetteers-Chittagong*, (Dacca: Pakistan Government Press, 1970), 452.

২০ পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৪) পৃ. ১০১।

২১ W.H. Thomson, *Census of India, 1921, Bengal Report*,(Culcutta: Bengal Sacratariat Book Depot, 1923), p.86.

২২ কমল চৌধুরী (সম্পা.), *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০), ৮২।

২৩ William Hunter, *A Statical Account of Chittagong,* (London: Trubner & Co., 1877), 120.

২৪ ওহিদুল ইসলাম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, (চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ), ৭৪।

২৫ S.W. Goode, *Municipal Culcutta*, (Kolkata: Corporation of Calcutta, 1916), 274-276.

২৬ A.L.Clay, *Leaves from a Diary in Lower Bengal*, (London: Macmillan & Company, 1896), 143.

২৭ নবীনচন্দ্র সেন, *আমার জীবনী*, ২য় খন্ড, (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯ ব.), ৩৯৬-৪০৪।

২৮ হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর, *আহাদিসুল খাওয়ানিন (চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস)*, (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ. ২০৮।

২৯ W. H. Thomson, *Bengal Municipal Administration Report, 1921-1922*, (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1923), para. 20, 8-9.

৩০ আবদুল হক চৌধুরী, বন্দর শহর চট্টগ্রাম, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), ২১৭।

৩১ নবীনচন্দ্র সেন, *আমার জীবনী*, ১ম খন্ড, (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯ ব.), ৩৯৬।

৩২ আবদুল হক চৌধুরী, *শহর চট্টগ্রামের ইতিকথা*, (চট্টগ্রাম: কথামালা, ১৯৮৫), ২০৭।

৩৩ নবীনচন্দ্র সেন, *আমার জীবনী*, ১ম খন্ড, (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯ ব.), ৩৯৭।

৩৪ আবদুল হক চৌধুরী, বন্দর শহর চট্টগ্রাম, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), ২১৮।

৩৫ নবীনচন্দ্র সেন, *আমার জীবনী*, ১ম খন্ড, (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯ ব.), ৩৯৮।

৩৬ নবীনচন্দ্র সেন, *আমার জীবনী*, ২য় খন্ড, (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯ ব.), ৪০৩-৪০৯।

৩৭ *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), ১২১।

৩৮ কমলেশ দাশগুপ্ত, *চট্টগ্রাম বিদ্রোহ: কত উৎস কত মুখ*, (চট্টগ্রাম: খড়িমাটি, ২০২০), পৃ. ১২।

৩৯ ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩), ৫১৯-৫২০।

৪০ R. Ramchandra, *Urbanization and Urban System in India*, (New Dehli: Oxford University Press, 1989), 22.

৪১ ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩), ৫২০।

৪২ R. Roy, *Urban Roots of Indian Nationalism-Pressure Groups and Conflict of Interests in Culcutta City Politics (1875-1939),* (New Dehli: Oxford University Press, 1979), 138.

৪৩ *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ৩য় খন্ড, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), ১৩৮।

৪৪ আবদুল হক চৌধুরী, *শহর চট্টগ্রামের ইতিকথা*, (চট্টগ্রাম: কথামালা, ১৯৮৫), ২০৯।